পিলখানার হত্যাকান্ডঃ ব্যর্থ রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে কি বাংলাদেশ?

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 March 2009 01:17

বাংলাদেশ যে কত তীব্র গতিতে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে পিলখানার হত্যাকান্ড হল তারই প্রমাণ। কোন সভ্য দেশে এমন ঘটনা বিরল। রোগ তিলে তিলে বেড়ে উঠার পরই একদিন সেটি প্রচন্ড রক্তক্ষরণ ঘটায় এবং মুহুর্তের মধ্যেই রোগীর জীবন সাঙ্গ করে। একই রূপ অবস্থা জাতীয় জীবনের বিপর্যয়গুলোর ক্ষেত্রেও। সেগুলোর পিছনেও দীর্ঘকাল ধরে জমে থাকা কারণ থাকে। ঢাকার পিলখানার নৃশংস হত্যাযজ্ঞটিকে যারা কতিপয় বিপথগামী সৈনিকের দ্বারা সংঘটিত দৈবাৎ কর্ম বলেন তারা সেটি বলেন গুরুতর এ ঘটনাকে লঘুতর করার মতলবে। বলেন বিষয়টির গভীরে না গিয়েই। এ নৃশংস ঘটনাটি কতিপয় মাথাগরম সৈনিকের কাজ ছিল না, সেটি হলে সেদিন পিলখানায় উপস্থিত দশ হাজারেরও বেশী পেশাদার সেপাহীর সামনে করার সাহস তারা পেত না। অনেকেই বাধা দিত। ডাকাতের নৃশংস কাজে গ্রামের নিরস্ত্র মানুষও বাধা দেয়। ডাকাতকে তারা অনেক সময় পাকড়াও করে। কিন্তু সেদিন পিলখানায় যা ঘটেছে সেটি বাংলার কোন নিরস্ত্র ও নিশীত পল্লীর ঘটনা ছিল না,
ঘটেছে হাজার হাজার সশস্ত্র সৈনিকের চোখের সামনে। এবং দিন-দুপুরে। কতজন বিডিআর সেপাহী সে কাজে সমর্থন দিয়েছে সে তথ্য নেই। কতজন বাধা দিয়েছে সে প্রমাণও নেই। তবে বাধা দিয়ে থাকলেও তারা যে অতি নগন্য সংখ্যয় ছিল তা নিয়ে কি সন্দেহ আছে? পিলখানার ন্যায় এক ক্ষুদ্র জায়গায় দশ হাজার সৈনিকের যে জমায়েত হয়েছিল সেদিন দেশের আর কোথাও নিরাপত্তা বাহিনীর এতবড় জমায়েত ছিল না। নিরাপত্তা বাহিনীর কাজ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আর সে নিরাপত্তা রক্ষার কাজটি দূরের মাঠে-ময়দানে, সীমান্তে বা রাজপথে ছিল না, ছিল তাদেরই হেডকোয়ার্টরে। কিন্তু নিরাপত্তা রক্ষার সে কাজে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সেদিন দশ হাজার সৈনিকদের মাঝে যদি কয়েক শত সৈনিকও এ হত্যাযজ্ঞে বাধা দিতে এগিয়ে আসতো তবে সেখানে যুদ্ধ হত। কিছু লোকের নৈতিকতার একটি ইতিহাস সৃষ্টি হত। তখন আর্মি অফিসারদের সাথে বহু শত সেপাহীও মারা যেত। কিন্তু সেটি হয়নি। এ ঘটনা নিয়ে তাই গভীর ভাবে ভাবতে হবে। কেন এমনটি হল এবং কি এর প্রতিকার তার কারণও খুঁজে বের করতে হবে। দু’চার জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসীতে লটকালেই মূল সমস্যার সমাধান হবে না। বরং আসল রোগটির কোনদিন চিকিৎসাই হবে না। আর রোগের চিকিৎসা না হলে রোগ যেমন না সেরে দিন দিন বেড়ে যায়, তেমনি নৃশংস অপরাধের সঠিক বিচার না হলে সেটিও শতগুণে বেড়ে যায়। বাংলাদেশ দূর্নীতিতে বিশ্বে বার বার যেভাবে শিরোপা পেল সেটি্র মুল কারণ তো এটিই যে, দূর্নীতির বিরুদ্ধে এদেশে সুবিচার হয় না। বরং দূর্নীতিবাজদের ক্ষমতায় বা প্রশাসনে বসানোই এদেশের রীতি।

প্রতি অপরাধেরই মটিভ বা উদ্দেশ্য থাকে। সে মটিভটি ধরতে না পারলে ঘটনার নায়কদের ধরাও অসম্ভব। মটিভ ধরতে হলে প্রথমে নিশ্চিত হতে হয়, ঘটনায় লাভবান পক্ষ কোনটি? ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষই বা কারা? কোন বিজ্ঞ আদালতই ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে কখনই আসামীর কাঠগড়ায় তোলে না। অপরাধের নায়ক হিসাবে কখনই তাদেরকে সন্দেহ করেনা। পিলখানার ঘটনায় লাভবান হয়েছে তারাই যারা বাংলাদেশেকে দূর্বল ও প্রতিরক্ষাহীন দেখতে চায় এবং বিলুপ্ত করতে চায় বাংলাদেশের সীমান্ত। বাংলাদেশে এমন একটি চিহ্নিত রাজনৈতিক পক্ষ আছে যারা দেশের সীমান্তকে ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগের সৃষ্ট এক সাম্প্রদায়ীক অনাসৃষ্টি মনে করে। ভারত থেকে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন এক মানচিত্র গড়ার সে চেতনাকে তারা রাজাকারের চেতনা বলে। এ পক্ষটির কাছে তাই অপ্রয়োজনীয় মনে হয় দেশের সীমানা। ভারত এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরের ভারতভক্ত পক্ষটি সে কথা শুধু একাত্তর থেকেই নয়, সাতচল্লিশ থেকেই বলে আসছে। একাত্তরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা যাওয়ার সাথে সাথে সীমানা খুলে দিয়েছিল। বাংলাদেশের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়াকে তারা বিলাসিতা মনে করে। শেখ মুজিব তাই সেনাবাহিনী বাদ দিয়ে রক্ষিবাহিনী গড়তে বেশী মনযোগী ছিলেন। আর রক্ষিবাহিনীর মূল কাজ ছিল, তার সরকারকে নিরাপত্তা দেওয়া, দেশের প্রতিরক্ষা নয়। আওয়ামী লীগ-সমর্থক বুদ্ধিজীবীগণ তাদের সে মনের কথাটি কখনই গোপন রাখেনি। তাদের ক্ষোভ, ১৯৪৭ সালের ভারত-বিভক্তিতে বাঙ্গালী বিভক্ত হয়েছে এবং ক্ষতি হয়েছে বাঙ্গালীর। তারা হারিয়েছে কোলকাতা। হারিয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী। তাই বাংলাদেশের সীমান্ত-বিলুপ্তির কোন ঘটনা ঘটনাচক্রে ঘটলেও তাতে তাদের মাঝে ক্ষোভ বাড়ে না, বাড়ে পুলক। পিলখানার ঘটনার পর প্রায় সপ্তাহ খানেক ধরে বাংলাদেশের সীমান্তে কোন প্রহরা ছিল না। খোলা ছিল বাংলাদেশের বর্ডার। পাকিস্তানের ৬০ বছরের জীবনে এমন কান্ড এক দিনের জন্য কেন একটি মুহুর্তের জন্যও ঘটেনি। অথচ সেটি বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘটলো সপ্তাহ কাল ধরে। একটি দেশের নিরাপত্তার জন্য এটি কি কম দুশ্চিন্তার কারণ? অথচ তা নিয়ে আওয়ামী লীগ মহলে কোন ক্ষোভ নেই, কোন দূঃখ্যও নেই। তাদের কলামিষ্টগণ সেনা-অফিসারদের হত্যা নিয়ে লিখলেও তা নিয়ে এক লাইনও লেখেন না। যেন কিছুই ঘটে নি। তারা যেন কিছু দেখেনি বা শোনেনি। একটি দোকানের দরজা এক দিন, এমন কি এক ঘন্টা প্রহরাহীন থাকলে দোকান মালিকের ঘুম হারাম হয়ে যায়। অথচ একটি দেশ দোকান নয়। একটি দেশের সীমান্ত প্রহরাহীন হলে তাতে বিপন্ন হয় প্রতিরক্ষা, স্বাধীনতা ও ইজ্জত। ফলে শংকা বাড়ে প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের। তাই বিশ্বের কোন সভ্য জাতি এক সপ্তাহ দূরে থাক, এক মুহুর্তের জন্যও সীমান্ত থেকে প্রহরা তুলে নেয়না। শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে দীবারাত্র পাহারার ব্যবস্থা করে। যে

1 / 5

পিলখানার হত্যাকান্ডঃ ব্যর্থ রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে কি বাংলাদেশ?

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 March 2009 01:17

কোন সভ্য দেশের বাজেটে ব্যয়ের এটিই সর্বোচ্চ খাত। দেওয়াল ছাড়া মা-বোনের ইজ্জত থাকে কি? তাই ভদ্রজনের আত্মসম্মানবোধ ধরা পড়ে তার ঘরের দেওয়াল দেখে। তেমনি মজবুত প্রতিরক্ষার বিষয়টিই। আওয়ামী লীগের সে চিন্তাটিই নেই। বেদেনীদের ন্যায় এদের চিন্তা শুধু নৌকাখানির নিরাপত্তা নিয়ে। এর একটি মনস্তাত্তিক কারণও রয়েছে। তাদের বিশ্বাস দেওয়ালের ওপারের মানুষগুলো তাদের একান্ত আপনজন। তাদের থেকে কোনরূপ আক্রমনের কথা তারা ভাবতেই পারে না। তারা ভাবে, দেওয়াল দিলে বরং নিজেদের বিপদে-আপদে তাদের থেকে সাহায্য পেতে অসুবিধা। এমন একটি চেতনার কারণিই আওয়ামী লীগের শাসনামল সেনাবাহিনীর জন্য ডেকে আনে চরমতম দূর্দিন।

শেখ হাসিনা বলছেন, পিলখানার ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার তিনি করবেনই। একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? নিরপক্ষ বিচারের জন্য শর্ত হল সরকারের নিরপেক্ষ মানসিকতা। কিন্তু সে মানসিকতা কি সরকারের আছে? সরকার ঘটনার যে ব্যখ্যা খাড়া করেছে সেটি হল, একাত্তরের তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীরা এ ঘটনার নায়ক। তাদের বিচার ঠেকানোর জন্য তারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। অপরদিকে ঘটনার তদন্তের দায়িত্বে নিয়োজিত বাণিজ্য মন্ত্রী ফারুক খান বলেছেন, একাজ জেএমবির। আওয়ামী বুদ্ধিজীবী চক্রের গুরু আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরি বলেছেন, "খালেদা জিয়া, জামায়াতের নিজামী আর মোজাহিদকে রিমান্ডে নিলেই আসল খবর বেরিয়ে আসবে।" এভাবে সরকার দোষ চাপাচ্ছে বিরোধীপক্ষের উপর। অর্থাৎ বিচারকাজেও তারা রাজনীতি টেনে এনেছেন। শেখ হাসিনা এ থেকে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চান। চান বিচারের নামে সেনাবাহিনীকে খুশি করতে। সে সাথে সায়েস্তা করত চান প্রতিপক্ষ ইসলামপন্থিদের। ভাবছেন ইসলামপন্থিদের জড়াতে পারলে মার্কিনীদেরও মদদ পাওয়া যাবে। খুশি করা যাবে ভারতকেও। তাই বিচার শুরু না হলে কি হবে, আওয়ামী সমর্থক মিডিয়াতে এ ঘটনার সাথে ইসলামপন্থিদের জড়িয়ে প্রচার শুরু হয়েছে অতি জোরেশোরেই। যেন শেখ হাসিনা ও তার সরকার আসল অপরাধীকে চিনে ফেলেছে। এখন আদালতের কাজ হল, শেখ হাসিনা এবং তার দলের মন্ত্রী ও বুদ্ধিজীবীরা যে এ ব্যাপারে সঠিক বা সত্যবাদী সেটি প্রমাণ করা। বিচারের রায় ভিন্ন কিছু হলে শেখ হাসিনা ও তার দলের লোকেরা যে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে সেটি কি তারা মেনে নিবেন? মেনে নেওয়ার জন্য যে নৈতিক বল প্রয়োজন, সেটি কি তাদের আছে? বিচারের রায়কে গ্রহনীয় করতে হাসিনা সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিলেত থেকে গোয়েন্দা কর্মকর্তা এনেছেন। অথচ সাক্ষ্য-প্রমাণ রক্ষার প্রাথমিক কাজও তারা সঠিক ভাবে করেনি। বরং অসম্ভব করে দিয়েছে। খুনের পর আসামীকে নিরাপদে পালাতে দিলে তাকে ধরা এবং তাকে খুনী রূপে প্রমাণিত করা কি এতই সহজ? প্রায় দুই দিন ধরে নৃশংস খুন চলছে পিলখানাতে। ধর্ষণ চলেছে মহিলাদের উপর। সেনাবাহিনীকে সেখানে ঢুকতে দেয়নি। আলামতও সংগ্রহ করতে দেয়নি। সেনাবাহিনী বা পুলিশকে পিলখানার দেওয়াল ভেঙ্গে খুনীদের বা ধর্ষণকারিদের পালাবার রাস্তা বন্ধ করতেও দেয়নি। অথচ যখন তারা পালিয়ে যাচ্ছিল প্রকৃত অপরাধীদের হাতে-গায়ে-কাপড়ে ও প্রতি অঙ্গে প্রচুর আলামত্ ছিল। ডিএনএ-র ছড়াছড়িও ছিল। সরকার দুইদিন ধরেও এব্যাপারে কোন সিন্ধান্ত নিতে পারিনি। অথচ ন্যায় বিচারের স্বার্থে এ কাজটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে সহজ। সরকার ন্যায়-বিচারে আগ্রহী হলে অন্ততঃ এ সহজ কাজটি অতি দ্রুত করতে পারত। কিন্তু সেটি করেনি। করার চেষ্টাও করেনি। এখন নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকতে বিদেশীদের ডেকে এনেছে। অপরাধী খোঁজার দায়ভার চাপাচ্ছে অন্যদের কাঁধে। অথচ মার্কিনীরা এখনও ১১ই সেপ্টম্বরের কোন সফল তদন্ত করতে পারেনি। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনী এখনও পারেনি লন্ডনে ৭ই জুলাইয়ের হত্যাকান্ডের একটি সফল তদন্ত করতে। কথা হল, নিজ দেশে যাদের এত ব্যর্থতা তারা হাজার মাইল দূরের এক দেশে এসে অপরাধী ধরিয়ে দিবে এটি কি ভাবা যায়? আহাম্মকি আর কাকে বলে?

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব যৌথ ভাবে অর্পিত সেনাবাহিনী ও বিডিআরের উপর। বিডিআরের সদস্য সংখ্যা ৫০ থেকে ৬০ হাজার। আর সেনাবাহিনীর সেপাহীদের সদস্য সংখ্যা ৭০-৮০ হাজারের মত। বিডিআরের নিজস্ব অফিসার নেই, সে দায়িত্ব পালন করে আর্মি অফিসারগণ। অফিসারগণই সেপাহীদের চালিকাশক্তি। অতএব অফিসার ছাড়া বিডিআরের ৫০/৬০ হাজার সৈন্য অভিভাবকহীন। ফল দাঁড়ালো, বিডিআরের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার সৈন্য হয়ে পড়লো সম্পূর্ণ অকার্যকর তথা যুদ্ধ লড়ার অনুপোযোগী। আর এতে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হল দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনী। এ ঘটনাটির ফলে প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে পারস্পারিক বিশ্বাস, শৃঙ্খলা ও একতায় যে ভয়ংকর ক্ষত সৃষ্টি হল সেটি কি সহজে দূর হবার? এ মহৎ গুণগুলো ধান-গম বা আলু-পটল নয় যে ক্ষেতে প্রতি বছর ফলবে। বরং এ গুণগুলো গড়ে তুলতে যুগ যুগ লাগাতর মেহনত করতে হয়। আগাছা নির্মূলের ন্যয় বিশ্বাস ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রতিটি উদ্যোগকেও নির্মূল করতে হয়। অপরাধীদের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রমাণ পাওয়া গেলে দৃষ্টান্তমূলক শস্তি দিতে হয়।

2 / 5

পিলখানার হত্যাকান্ডঃ ব্যর্থ রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে কি বাংলাদেশ?

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 March 2009 01:17

পিল খানায় সেনা-অফিসার হত্যাকান্ডের পর আর্মি অফিসার কি আর বিডিআর বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে নিরাপত্তা বোধ করবে? পিলখানার এ বীভৎস ঘটনার পর বিডিআরের সেপাহীগণই বা কোন মুখে তাদের নেতৃত্বদানকারি আর্মি অফিসারের বিশ্বস্ত সৈনিক রূপে নিজেকে পরিচয় দিবে? এটি এক মনস্তাত্বিক বিষয়। নিছক বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা হবার নয়। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যেটি অপরিহার্য সেটি হলো সৈনিক ও তার অধিনায়কদের মাঝে সিমেন্ট-ঢালা প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় একতা ও সম্প্রীতি। পারস্পারীক অবিশ্বাস, গালিগালাজ, খুনখারাবী ও ধর্ষণ সে প্রাচীরের সিমেন্ট খুলে নেয়। তখন দেওয়াল এমনিতেই ধ্বসে পড়ে। এমন অনৈক্য গড়ার কাজ তাই দুষমনের। যারা বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিলীন করে নিজ দেহে বিলীন করতে চায়, এমন অনৈক্যে বাড়াতে একমাত্র তারাই খুশি হতে পারে। পারস্পারিক বিশ্বস্ততা ও শৃঙ্খলাই সামরিক বাহিনীর মূল শক্তি। অস্ত্র ও গোলাবরুদ নয়। অথচ পিলখানার ঘটনার পর সে বিশ্বস্ততা ও শৃঙ্খলা ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল। সামান্য গালিও পারস্পরিক সম্পর্ক হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। অথচ ২৫শে ফেব্রুয়ারী পিলখানায় যে নৃশংসতা ঘটে গেল সেটি শুধু গালিগালাজ নয়, নিছক হত্যাও নয়, বরং সেটি ছিল সেনা-অফিসারদের বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণা ও পৈশাচিকতার প্রচন্ড বিস্ফোরণ। বহু হত্যা তো বাংলাদেশের পথে ঘাটে প্রতিদিন হচ্ছে। হচ্ছে সন্ত্রাসীদের হাতে, হচ্ছে রাজনৈতিক দলের গুন্ডাদের হাতে। কিন্তু পিলখানার ঘটনায় যে ঘৃণা ও পৈশাচিকতা প্রকাশ পেল সেটি সব হত্যায় সচারাচর ঘটে না। হত্যার পর সেখানে লাশ বিকৃত করা হয়েছে, লাশে আগুন দেওয়া হয়েছে এবং বহু লাশ নর্দমায়ও ফেলা হয়েছে। ধর্ষিতা হয়েছে অফিসার পরিবারের নারীরা। লুট হয়েছে তাদের সহায়-সম্পদ ও গহনাপাতি। এ নৃশংসতা তো ডাকাত পাড়াতেও বিরল। ডাকাত অর্থ লুট করে। কিন্তু হত্যা ও হত্যা শেষে লাশ কি জ্বালায়? সেটি তো বিরল। কিন্তু সেটি পিলখানায় ঘটেছে। ঘৃনা ঘৃনারই জন্ম দেয়। এমন ঘৃনা ও এমন নৃশংসতায় যেটি প্রবল ভাবে বাড়ে সেটি পারস্পারিক অবিশ্বাস। আর এমন গভীর অবিশ্বাস কি সহজে দূর হবার? এমন গভীর অবিশ্বাস নিয়ে কি কোন সামরিক অফিসার তার অধিনস্ত বিডিআর সেপাহীদের নেতৃত্ব দিতে পারে? নিরাপত্তা দিতে পারে কি সীমান্ত রক্ষায়? এমন সেপাহীদের নিয়ে সে কি যুদ্ধ করতে পারে? তার নিজের ঘুম তো বরং হারাম হবে সেপাহীদের হাত থেকে সে কি করে নিজের ও নিজ পরিবারের নিরাপত্তা দিবে সে দুশ্চিন্তায়। তার ভয় থাকবে, তার হত্যায় যে গুলিটি ধেয়ে আসবে সেটি শুধু সামনে থেকে নয়, পিছন থেকেও। ফলে পিলখানায় যা ঘটলো তাতে বহু বছরের জন্য ভয়ানক ভাবে দূর্বল হল বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। দূর্বল হল স্বাধীনতা। যুদ্ধে হাজার হাজার সৈন্যের মৃত্যু ও বহু হাজার কোটি টাকার ক্ষয়-ক্ষতিতেও কোন দেশের এতবড় ক্ষতি হয়না। কারণ যুদ্ধে বিপুল লোক ক্ষয় ও অর্থক্ষয় হলেও লড়াইয়ের জন্য অপরিহার্য হল যে একতা, শৃঙ্খলা ও পারস্পারিক বিশ্বাস সেগুলি বিপন্ন হয় না। অথচ পিলখানার ঘটনায় সেগুলিই কর্পুরের ন্যায় হাওয়ায় উড়ে গেল। সৈনিকের সংখ্যা, যুদ্ধাস্ত্র, সেনানিবাসের সংখ্যা ও জাঁকজমক বাড়িয়ে এ ভয়ানক ক্ষতি কি পুরণ করা যাবে?

পিলখানার নৃশংস ঘটনার পর ভারতীয় নেতারা মুখে যাই বলুক বিপুল আনন্দে ডুগডুগি বাজানোর কথা। যদি না বাজায় তবে বুঝতে হবে তারা ঘাস খায়। বাংলাদেশের পিছনে ভারত সদাসর্বদা এ চেষ্টায় লেগে আছে যে, বাংলাদেশ বেঁচে থাকুক নেপাল ও ভুটানের ন্যায় নামেমাত্র এক স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে। চায়, ভারতীয় পণ্যের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হোক বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষের বিশাল বাজার। চায়, ট্রানজিটের নামে বাংলাদেশের ভূমি ভেদ করে ঢুকুক ভারতের হাজার হাজার বাস-ট্রাক ও ট্রেনের বহর, যেমন ঢুকে পশ্চিম বাংলা, বিহার বা ত্রিপুরা ভেদ করে। ভারত কি সে অভিলাষের কথা কখনও গোপন রেখেছে? বিশ্বব্যাপী এ মন্দার বাজারে এত বড় বাজার খুঁজে পেতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও হিমসীম খাচ্ছে। হিমসিম খাচ্ছে চীন, জাপান, ব্রিটেন ও জার্মানির মত শিল্পোন্নত দেশ। ভারত কি এতই সাধু যে তারা বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষের এ বিশাল বাজার যা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহারের সম্মিলিত বাজারের চেয়েও বৃহৎ তাতে অমনযোগী হবে? এ বাজার দখলে তো এক সময় ইংরেজরা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে এসেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন ইরাকে অর্থ ও রক্ত ব্যয় করেছে দেশটির তেলের উপর দখলদারি প্রতিষ্ঠার জন্য, ভারতও তেমনি ১৯৭১-এ বহু হাজার সৈনিকের প্রাণহানী ও শত শত কোটি টাকার অর্থহানীর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়েছে নিজেদের সে অর্থনৈতক ও রাজনৈতিক দখলদারিত্ব নিশ্চিত করতে। অর্থনৈতিক বাজারের বিষয়টি তাদের কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তারা নেপাল ও ভূটানের মত দেশের ক্ষুদ্র বাজারেও বাংলাদেশের হিস্যা দিতে রাজী নয়। তাই বাংলাদেশের কাছে ৪০০ মাইলের ট্রানজিট চাইলেও বাংলাদেশকে নেপালে ও ভূটানে যাওয়ার ১২ মাইল ট্রানজিট দিতেও রাজী নয়। বাংলাদেশের বাজার দখলের বিষয়টি ভারত কখনই গোপন রাখেনি। বাজার দখলের লক্ষ্যে তারা বাংলাদেশে রাজনৈতিক দখলদারিত্বও চায়। আর সেজন্য তাদের কাছে অপরিহার্য হল, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকেও দূর্বল রাখা। মুজিব আমলে তাই দূর্বল করতে রক্ষিবাহিনী গড়েছিল। একই লক্ষ্যে একাত্তরে পাকিস্তান আর্মির ফেলে যাওয়া হাজার হাজার কোটি কোটি টাকার যুদ্ধাস্ত্র বাংলাদেশে আর্মির হাতে পৌঁছতে দেয়নি। ভারত সেগুলো্ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সযত্নে নিয়ে গেছে নিজ দেশের ক্যান্টনমেন্টে। অথচ বাংলাদেশের ভারতপন্থি রাজনৈতিক মহল ও মুক্তিযোদ্ধাদের দাবী, বাংলাদেশে নাকি তারা জয় করেছে। কথা হল, তারা জয়

3 / 5

পিলখানার হত্যাকান্ডঃ ব্যর্থ রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে কি বাংলাদেশ?

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 March 2009 01:17

করলে পাকিস্তানের ফেলে যাওয়া অস্ত্র ভারতে গেল কেমন করে? ১৯৭৫ সাল অবধি মিশরের দেওয়া কিছু পুরনো খয়রাতী ট্যাংক ছাড়া বাংলাদেশ আর্মির কাছে কোন ট্যাংকই ছিল না। ছিল না কোন বিমান। একই লক্ষ্যে বাংলাদেশ যাতে কোন আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র না ক্রয় করে তার উপরও ভারতের কড়া নজরদারি। এরশাদের আমলে চীন থেকে নিম্ন মানের কয়েকখানি যুদ্ধ বিমান কেনা হয়। আর তাতেই ভারতে কত হৈচৈ! ভারতীয় মিডিয়ায় অভিযোগ উঠে, বাংলাদেশ আরেক পাকিস্তান হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বাজার দখলের লক্ষ্যেই সত্তরের দশকে ভারত মুজিব সরকারের সাথে সীমান্ত জুড়ে মুক্ত বাণিজ্যের চুক্তি করে। আর এভাবে তখন বিলুপ্ত হয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সীমান্ত। ভারত এখনও সেটিই চায়। প্রতিরক্ষা বাহিনী দূর্বল করার মধ্য দিয়ে সেটি ভারতের জন্য আরো সহজ হয়ে গেল।

বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে এত ঘৃণা ও এত নৃশংসতার কারণ খুঁজে বের করতে হবে। নইলে সৈন্যপালন ও দেশ প্রতিরক্ষার সব উদ্যোগই ব্যর্থ হবে। এতে শুধু জনগণের খরচই বাড়বে। এবং বিপন্ন হবে নিরাপত্তা। অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যায়, সেপাহীদের শুধু গুলী-চালানো শেখানোটাই গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু কাকে উদ্দেশ্য করে গুলি চালাতে হবে এবং কাকে বাঁচাতে হবে সে মৌলিক শিক্ষাটিই দেওয়া হয়নি। আর পিলখানার হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে সে ব্যর্থতাটাই প্রকটভাবে আবার বের হয়ে এল। আর এ ব্যর্থতা শুধু কি বিডিআরের? সেনাবাহিনীর সেপাহীদের মাঝেই কি কম? তারা তো ১৯৭৫এর ৭ই নভেম্বরে বহু সেনা-অফিসার হত্যা করে সেটি প্রমাণও করেছে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সর্বার্থেই একটি সেকুলার সেনাবাহিনী। এমন সেকুলার হওয়া নিয়েই তাদের গর্ব। এখানে কাজের প্রেরণা আসে নিছক চাকুরি এবং চাকুরি-লব্ধ বেতন পাওয়ার প্রেরণা থেকে। সেকুলার চেতনায় আল্লাহর ভয়ের কোন গুরুত্ব নেই। সে চেতনায় তেমন ভয় কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতা। এ সেনাবাহিনী জন্ম লাভ করেছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের হাতে। এবং তারা এ সেনাবাহিনীকে গড়েছিল সেকুলার মূল্যবোধে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে এ সেনাবাহিনীর সামান্যই আদর্শিক সংস্কার হয়েছে। ফলে ব্রিটিশ ও মার্কিন বাহিনীর সাথে বিশ্বের নানা দেশে তাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ লড়তে আদৌ সমস্যা হয় না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আজ মার্কিনীদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে হত্যাকান্ড চালাচ্ছে সেদেশের সীমান্ত প্রদেশে। সেখানে যেরূপ মুসলিম হত্যা করছে সেটি সে অভিন্ন মূল্যবোধের কারণেই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠান পর সেদেশের পার্লামেন্ট দেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল, তখন সেনানিবাসগুলি ছিল নিজদেশের অভ্যন্তরে অন্য দেশের সংস্কৃতির দ্বীপ। পাকিস্তান যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সেটিকেই এ সেকুলার সেনাবাহিনী আস্তাকুঁড়ে পাঠিয়েছে। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করতে না পারলে কি হবে, তারা বার বার জয় করেছে নিজেদের দেশকেই। মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে সেনানিবাসগুলো হয়ে পড়েছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। যেন পাশ্চাত্য দেশ থেকে তুলে এনে এগুলো বসানো হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। সেনানীবাসের সংস্কৃতি, রীতি-নীতি এমনকি খেলাধুলাও ভিন্ন। বাংলাদেশের মত গরীব দেশে তাদের চাহিদা পূরণ করতে ১০/২০টি ফুটবল মাঠের সমান গলফের মাঠ গড়া হয়। এমনকি সেনানীবাসের গাছগুলোকে রং পড়ানো হয়। সাংস্কৃতিক এ বিভাজনের কারণে সেনা অফিসারদের সাথে সাধারণ মানুষেরই শুধু নয়, সাধারণ সেপাহীদের দূরত্ব বেড়েছে ভয়ানক ভাবে। এমন বিভক্তি যে কোন জাতির জন্যই আত্মঘাতি। (এ ব্যাপারে লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা অতি করুণ। ঢাকায় এক বিয়ের দাওয়াতে ৬-৭ জনের সাথে একই টেবিলে খাচ্ছিলেন এ নিবন্ধের লেখক। সে টিবিলে ছিলেন সেনাবাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। হঠাৎ করে তিনি টের পান টেবিলে একজন সেপাহীও আছে। সাথে সাথে তিনি খাওয়া ছেড়ে টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন ছেলেপক্ষের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তার অবস্থা দেখে সেদিনের মেজবান মেয়েপক্ষ বড়ই বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিলেন। নানারূপ অনুরোধ করেও তাকে সে টিবিলে আর বসাতে পারেনি। সেদিন এ ঘটনাটি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদের মত্ই অতি নোংরা মনে হয়েছিল।) সেপাহীদের সাথে এমন আচরণ কি সমর্থণ করা যায়? ইসলামে তো এমন বর্ণবাদী আচরণ হারাম। হযরত ওমর (রাঃ) তো তার চাকরকে উঠের পিঠে চড়িয়ে রশি ধরে টেনেছেন। সুলতান মাহমুদ সাহাবীদের ন্যায় নবী (সাঃ)র সাহচর্য পাননি। অথচ তাঁর মানবতা ছিল কত উঁচু! তাঁর সাথে একই জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন তাঁর চাকর আয়াজ। অথচ সুলতান মাহমুদের রাজ্য ভেঙ্গে ৫০টিরও বেশী বাংলাদেশে গড়া যেত। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রায় সবাই মুসলমান। কিন্তু মুসলমান-সুলভ সে আচরণটি কোথায়?

সেনানিবাসগুলোতে যে সংস্কৃতির পরিচর্যা দেওয়া হযেছে সেটি ইসলামি সংস্কৃতি নয়। বাঙ্গালীরও নয়। সেটি পাশ্চাত্যের। ফলে সেনাবাহিনীর অফিসার ও সেপাহীদের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে চলছে সাংস্কৃতিক সংঘাত। সে সাথে বেড়েছে অর্থনৈতিক সংঘাতও। তারা জাতিসংঘের চাকুরি নিয়ে আখের গোছাতে যায়। কিন্তু সে সুযোগ বিডিআর সেপাহীদের নেই। এটি বে-ইনসাফি। এটি অসমতা। এমন বে-ইনসাফি ও অসমতা কোন দেশেই সৌহার্দ ও সম্প্রীতির জন্ম দেয় না। জন্ম দেয় সংঘাতের। বে-ইনসাফি নিয়ে এমন কি একই মায়ের পেটে জন্ম নেওয়া দুই ভাইও শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। দেশের

4 / 5

পিলখানার হত্যাকান্ডঃ ব্যর্থ রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে কি বাংলাদেশ?

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 March 2009 01:17

খেদমত শুধু সেনাবাহিনীর অফিসারগণ করেন না, সেপাহীগণও করে। একজন কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক ও সাধারণ কর্মচারিও করে। সাধারন সেপাহীদের পরিবার নিয়ে সেনানিবাসে থাকার সুযোগ নেই, মাসের পর মাস তাদেরকে পরিবার থেকে দূরে থাকতে হয়। সেখানে অফিসারদের জন্য গড়া হয় বিশাল আকারের কোয়ার্টার। তাদের জন্য রাজধানীর অতি ব্যয়বহুল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জমিবরাদ্দ দেওয়া হয়। জমির উপর বহুতল বাড়ী নির্মাণের জন্য সহজ শর্তে লোনেরও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এমন বাড়তি সুযোগ-সুবিধা ব্রিটিশ বা মার্কিন সেনাবাহিনীর কোন অফিসারও পায়না। পায় না এমনকি প্রাতিবেশী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন অফিসারও।

সেনা-অফিসারদের বিরুদ্ধে বিডিআর সেপাহীদের ক্ষোভ ছিল –সেটি সত্য। কিন্তু সেটি এতদিন বিস্ফোরিত না হয়ে কেন এখন হল? মশা-মাছি ও নর্দমার কীট বুঝে কখন বংশ বিস্তার করতে হয়। পতঙ্গ বুঝে কখন ডানা মেলাতে হয়। এসব ক্ষুদ্রজীবেরাও পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝে। তেমনি অবস্থা খুনী, ডাকাত ও দুর্বৃত্তদেরও। রাজনীতির হাওয়া বুঝে তারা যেমন গা ঢাকা দেয়, তেমনি আবার স্বরূপে হাজির হয়। বিডিআরের মাঝে ঘাপটি মেরে বসে থাকা দুর্বৃ্ত্ত সেপাহীরা সে উপযোগী হাওয়াটি চিনতে আদৌ ভূল করেনি। তাই শুধু উৎসব ভরে খুন, ধর্ষণ ও লুটতরাজই করেনি, নিরাপদে বেরও হয়ে যেতে পেরেছে। বর্তমান সরকার থেকে দেশের বড় বিপদ এখানেই। অতি নৃশংস বর্বরতার নায়কেরাও খবর পেয়ে গেছে এখনই তাদের সুবর্ন সুযোগ। ফলে তারা দলে দলে নেমেছে বীভৎস অপকর্মে। ফলে রক্তাক্ত হচ্ছে শুধু সেনানিবাসই নয়, রক্তাক্ত হচ্ছে এবং বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও। রক্তাক্ত হচ্ছে হাটবাজার ও রাজনৈতিক অঙ্গন। অচলাবস্থা নেমে এসেছে শিল্পাঙ্গণে। মুজিবামলেও অবস্থা এমনটিই ছিল। সন্ত্রাসীদের ভয়ে অসংখ্য মানুষকে তখন ঘরবাড়ী ছেড়ে বন-জঙ্গলে রাত কাটাতে হয়েছে। দেশ আজ দ্রুতগতিতে সেদিকেই ধেয়ে চলেছে। একটি রাষ্ট্রের ব্যর্থ রাষ্ট্র হতে এরপরও কি কিছু বাঁকি থাকে? শত শত মানুষ আজ লাশ হচ্ছে সন্ত্রাসীদের হাতে। সফল রাষ্ট্রের অর্থ শুধু এক পাল মন্ত্রী থাকা নয়, তাদের মুখে দম্ভভরা বুলি থাকাও নয়। বরং দেশবাসীর কল্যাণে কিছু করার সামর্থ। যারা দেশের নিভৃত পল্লিতে দূরে থাক, রাজধানীর সেনানীবাসেও জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা দিতে পারে না এবং ধরতে পারে না নৃশংস খুনীদের -তাদের সফলতা কোথায়?

5 / 5